তারিখ 24 AUG 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

যুগান্তর

উচ্চশিক্ষায় নিম্ন ব্যবস্থাপনা

দেশপ্রেমের চশমা

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

একটি দেশের সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে ওই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। প্রাথমিক শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, উচ্চশিক্ষার পথ ধরেই দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, কৃষি, স্বাস্থ্য, রাজনীতি, সুশাসনসহ সব ক্ষেত্রেই উন্নয়ন অর্জন ও তা টেকসই করার স্বার্থে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কর্মতৎপরতা প্রয়োজন। এজন্য এসব দেশে প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার গুরুত্বও স্বীকার্য। বাংলাদেশও উচ্চশিক্ষার পথ ধরেই এগোচ্ছে। এ দেশে উন্নয়ন হচ্ছে। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতার কারণে সে উন্নয়ন সুপরিকল্পিত ও টেকসই হচ্ছে না। কারণ, এ দেশে রাজনীতি যেমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তেমনি উচ্চশিক্ষাও হয়ে পড়েছে রুগ্ন, মানহীন ও ক্ষেত্রবিশেষে সনদসর্বস্ব। অনেক কলেজেই রাজনৈতিক কারণে অনার্স মাস্টার্স ডিগ্রি চালু করা হলেও মানসম্মত শিক্ষক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নেই। ক্লাসরুমের লেখাপড়া খুবই দুর্বল। ৩৯টি সরকারি এবং প্রায় ৯০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও ভালো নয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার গুণগত মান বৃদ্ধি না করে সরকার জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নির্ণয়ে বিশ্বব্যাপী যেসব সূচক রয়েছে তাতে প্রথম ৫ হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এ দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজে পাওয়া যায় না। এশিয়া মহাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যেও বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান অনেক নিচে। অথচ একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হতো। নামকরা সব অধ্যাপকের সমাহার ঘটেছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। অন্য বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও অনেক খ্যাতিমান শিক্ষক পাঠদান করতেন। এসব শিক্ষকের অনেকেই নিজ নিজ একাডেমিক ডিসিপ্লিনে ছিলেন বিশ্বব্যাপী পরিচিত। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় রাজনীতি থাকলেও তার ব্যাপকতা আজকের মতো ছিল না। যোগ্যতা ও মেধা যাচাই করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হতো। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সবচেয়ে ভালো ফলাফল করতেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকেই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হতো। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। এখন কেবল মেধাবী হলেই কারও বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি হবে মনে করা যায় না। এর সঙ্গে লাগে দলীয় পরিচয় এবং অনেক ক্ষেত্রে আরও কিছু।

ভালো শিক্ষার্থীরা যদি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ না পান, তাহলে কীভাবে তারা ভবিষ্যতে ভালো শিক্ষক হবেন? কীভাবে ভালো গবেষক হবেন? কীভাবে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করবেন? কীভাবে নিজেরা নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করবেন? শিক্ষার্থীদেরই বা কীভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় আকৃষ্ট করবেন? কেউ দলীয় রাজনীতির পরিচয়ে শিক্ষক হিসেবে চাকরি পেলে তিনি তো লেখাপড়ায় কম গুরুত্ব দিয়ে দলীয় রাজনীতি চর্চায় অধিক মনোযোগ দেবেন। দলীয় পরিচয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা নিতে প্রয়াস পাবেন। সহকারী প্রক্টর হবেন। আবাসিক হলের হাউস টিউটর হবেন। অন্যান্য প্রশাসনিক পদে দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হবেন। হেকেপসহ বিভিন্ন প্রজেক্টের কাজে আগ্রহ দেখাবেন। গ্রন্থ রচনা ও গবেষণামূলক জার্নালে অবদানমূলক প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ না করে দলীয় প্রভাব খাটিয়ে পদোন্নতি পেতে চাইবেন। ছাত্র রাজনীতি আর শিক্ষক রাজনীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় এমন শিক্ষকের হাতে শিক্ষকতার মহান অহঙ্কার— সব শিক্ষার্থীর প্রতি সমান আচরণের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হলেও বলার কিছু থাকবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগের জন্য সবসময় আলাপ-আলোচনা হয়। বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ ব্যাপারে অনেক সময় এককভাবে উদ্যোগ নিয়েও কামিয়াব হতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য বাংলা বিভাগের একজন অধ্যাপককে প্রধান করে একটি কমিটি করে দেয়া হয়েছিল। ওই কমিটি বেশ কিছুদিন কাজ করে প্রতিবেদন দাখিল করে। সেই প্রতিবেদনে প্রভাষক নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা, প্রেজেন্টেশন এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু ওই রিপোর্ট বাস্তবায়ন না করে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিনকে প্রধান করে আরেকটি কমিটি করা হয়। সে কমিটি ধীরে-সুস্থে কাজ শুরু করতে করতে ইউজিসি সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির অভিন্ন নীতিমালা তৈরির কাজ শুরু করে। ফলে সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসির অভিন্ন নীতিমালা কেমন হয় সেদিকে মনোযোগ দেয়। কিন্তু ইউজিসির অভিন্ন নীতিমালা তৈরি করে যখন তা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়, তখন প্রায় সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সে নীতিমালা প্রত্যাখ্যান করে। কেন এমন হল? এ বিষয়ে শিক্ষক নেতাদের কাছে জানতে চাইলে তারা বলেন, এ নীতিমালার খসড়া নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছিল। তারা তাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু নীতিমালাটি চূড়ান্ত করার সময় তাদের পরামর্শগুলো উপেক্ষা করে সেটি সংশ্লিষ্ট কমিটি নিজ খুশিমতো তৈরি করেছে। নীতিমালাটি চূড়ান্ত করার পর কমিটি শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে আরেকবার বসলে এমন সমস্যা হতো না।

> ভালো শিক্ষার্থীরা যদি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ না পান, তাহলে কীভাবে তারা ভবিষ্যতে ভালো শিক্ষক হবেন? কীভাবে ভালো গবেষক হবেন? কীভাবে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করবেন? কীভাবে নিজেরা নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করবেন? শিক্ষার্থীদেরই বা কীভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় আকৃষ্ট করবেন? কেউ দলীয় রাজনীতির পরিচয়ে শিক্ষক হিসেবে চাকরি পেলে তিনি তো লেখাপড়ায় কম গুরুত্ব দিয়ে দলীয় রাজনীতি চর্চায় অধিক মনোযোগ দেবেন। দলীয় পরিচয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা নিতে প্রয়াস পাবেন। সহকারী প্রক্টর হবেন। আবাসিক হলের হাউস টিউটর হবেন। অন্যান্য প্রশাসনিক পদে দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হবেন।

কাজেই সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের জন্য অভিন্ন নীতিমালা কার্যকর করা যায়নি। এ নীতিমালার অনেক বিষয়ে ত্রুটি ধরা পড়েছে। এ পত্রিকার এ কলামেই আমি নিজেও ওই নীতিমালার ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করে 'অভিন্ন নীতিমালাটির গোড়ায় গলদ' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছি, যা ১৭ জুলাই প্রকাশিত হয়েছে। আরও অনেকে এ নীতিমালার সমালোচনা করে লিখেছেন। ইউজিসি চাইলে ওইসব ভুলত্রুটি চিহ্নিত করে সেগুলো সংশোধনপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সঙ্গে বসে আবারও নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির অভিন্ন নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নিতে পারে। এমন উদ্যোগ সফল করা না গেলে একেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একেকভাবে শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতি দেয়া হবে। সেক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। বর্তমান ব্যবস্থায় নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য বিরাজ করছে। অনেক ক্ষেত্রেই যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে অযোগ্যদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। স্বল্পসংখ্যক পদের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে বিভাগীয় চাহিদা না থাকলেও দলীয় শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশিসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। লিখিত পরীক্ষা ও প্রেজেন্টেশন পরীক্ষা না নিয়ে কেবল নামকাওয়াস্তে একটি মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ দেয়ায় এসব নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি করতে সুবিধা হচ্ছে। মৌখিক পরীক্ষার কোনো রেকর্ড না থাকায় সবচেয়ে ভালো মৌখিক পরীক্ষা প্রদানকারীকে না নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ পরীক্ষা প্রদানকারীকে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার ঘটনাও ঘটছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ এখন এমন নৈরাজ্যিক রূপ নিয়েছে যে, সম্প্রতি মাননীয় প্রধান বিচারপতিকেও বলতে হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহ্য বজায় রেখে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না।

বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ১৯৭৩ সালের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালিত হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে উপাচার্য নিয়োগ দেয়ার কথা, তা অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে হচ্ছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার তার স্বদলীয় অনুগত ও পছন্দের কোনো অধ্যাপককে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছে। এর ফলে উপাচার্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সমুন্নত রাখতে পারছেন না। তাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় যতটা মনোযোগ দিচ্ছেন, তার চেয়ে বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন গুণগান গেয়ে সরকারের গুডবুকে থাকতে। এ কারণে একাডেমিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রাজনৈতিক চরিত্র প্রকট হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর প্রধান পরিচয় হল তাদের একাডেমিক পরিচয়। ওই একাডেমিক পরিচয়কে যখন তাদের রাজনৈতিক পরিচয় অতিক্রম করে, তখন ওইসব প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক উন্নতি বিঘ্নিত হতে বাধ্য। অনেক শিক্ষক আজ বর্ণদলীয় পরিচয়ে পরিচিত। ছাত্রনেতারা নিহত হলে গণমাধ্যম তাদের একাডেমিক পরিচয় চাপা দিয়ে তাদের রাজনৈতিক পরিচয়ে সংবাদ ছাপে। পত্রিকার হেডলাইনে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের কোন বর্ষের শিক্ষার্থী নিহত হলেন এ পরিচয়ের বদলে কোন ছাত্র সংগঠনের কোন পদাধিকারী নিহত হলেন সে পরিচয় উঠে আসে। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে!

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেখভালকারী প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও (ইউজিসি) সফলভাবে কাজ করতে পারছে না। ইউজিসিতে দলীয় লোক নিয়োগ দেয়ায় এ প্রতিষ্ঠানটি ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিকসহ সার্বিক উন্নয়ন সরেজমিন দেখভাল করার জন্য সম্প্রতি অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন মন্ত্রিসভা ও জাতীয় সংসদে পাস হওয়া সত্ত্বেও এখনও ওই কাউন্সিল গঠন করা হয়নি। তবে দলীয় অনুগত অধ্যাপকদের দিয়ে এ কাউন্সিল গঠিত হলে আর যাই হোক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান বাড়বে না। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দলীয় পরিচয় আমলে না নিয়ে ন্যায়নীতির প্রশ্নে আপসহীন শিক্ষানুরাগী অধ্যাপকদের দিয়ে এমন কাউন্সিল গঠন করা হলেই কেবল উচ্চশিক্ষার নৈরাজ্য রোধে ইতিবাচক ফল পাওয়া যেতে পারে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (হেকেপ)-এর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা চলছে, তাতে আসল উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে বলে মনে হয় না। এর ফলে কোটি কোটি টাকা খরচ হলেও সে তুলনায় শিক্ষার উন্নয়ন হচ্ছে না। এর চেয়ে ওই টাকা দিয়ে যোগ্য ও গুণী শিক্ষকদের উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণায় অনুদান দিলে হয়তো ভালো ফল পাওয়া যেত। এর ফলে কিছু সম্মানিত শিক্ষক জ্ঞান বিতরণ ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে মনোযোগ না দিয়ে নতুন প্রজেক্ট কীভাবে পাওয়া যায় সে চেষ্টায় ব্যস্ত রয়েছেন। এসব প্রজেক্টে নিয়োজিত নবীন শিক্ষকরা জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞান সৃষ্টির চেয়ে প্রজেক্টের অর্থ ব্যয়ের হিসাব মেলানো এবং ভাউচার মেকিং বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠছেন। এর ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে উঠলেও জ্ঞানচর্চায় সমৃদ্ধি আসছে না।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাড়ে চার দশকেরও বেশি সময় পার হয়েছে। কিন্তু অপার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দেশটি সমৃদ্ধি অর্জনের পথে বেশিদূর এগোতে পারেনি। অর্থনৈতিকভাবে দেশটি এখনও মধ্যম আয়ের দেশ হতে পারেনি। দেশে গণতন্ত্র এখনও রুগ্ন অবস্থায় রয়েছে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি সাংঘর্ষিক। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহমর্মিতা ও সহনশীলতার চর্চা নেই। দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনী পরাজয় মেনে নেয়ার অভ্যাস গড়ে ওঠেনি। কোনো দল ক্ষমতায় গেলে আর ক্ষমতা ছাড়তে চায় না। জাতীয় সংসদসহ বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যাশিত মাত্রায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। আর এ-সবকিছুর জন্য বড় দায় বর্তায় শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। কারণ রাজনীতি, প্রশাসনসহ অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে যারা সেবা দিচ্ছেন, তাদের সবাই শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে এসব পদে আসেন। আর শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই যদি গলদ থাকে, এ ব্যবস্থা থেকেই যদি তারা শৃঙ্খলা, নিয়মতান্ত্রিকতা ও সুশাসনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে না আসেন, তাহলে কর্মজীবনে তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে কীভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবেন? কাজেই উচ্চশিক্ষার নিম্নগতি রোধ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মতান্ত্রিকতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার : *অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*
akhterny@gmail.com